

বাংলাদেশের অর্থনীতি যাদের ঘামে দাঁড়িয়ে, সেই শ্রমিকরাই সবচেয়ে অবহেলিত। তৈরি পোশাক খাতের (আরএমজি) নতুন মজুরি কাঠামো বাস্তবায়নে এক-তৃতীয়াংশ কারখানার অনীহা, আর ২২টি খাতের শ্রমিক এখনও দারিদ্রসীমার নিচে আয় করছেন। শুধু আরএমজি খাত নয়, কৃষি, নির্মাণ, হোটেল, বাস সার্ভিসসহ বহু খাতে শ্রমিকদের আয় এতটাই কম যে তা দিয়ে ন্যূনতম জীবনধারাও টিকিয়ে রাখা দায়। জাতীয় মজুরি কমিশন এখনও গঠিত হয়নি, বহু খাতে চার দশকেও হয়নি মজুরি পুনর্বিন্যাস। ফলে নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বাসাভাড়া, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যয়ে শ্রমজীবীরা কার্যত বাঁচার সংগ্রামে নিঃস্ব হয়ে পড়ছেন। গবেষকরা বলছেন, রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার ও কাঠামোগত সংস্কার ছাড়া শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা যাবে না।

তারা বলছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি যেভাবে শ্রমিকদের ঘামে গড়ে উঠেছে, তেমনি রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা। শুধু মে দিবসে ফুল আর বক্তৃতা দিয়ে শ্রমিকের জীবনমান বদলাবে না—এ জন্য চাই কার্যকর নীতি ও বাস্তবমুখী উদ্যোগ।

এক-তৃতীয়াংশ গার্মেন্ট কারখানা এখনও ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন করেনি

সরকার গত ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতে শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর নির্দেশনা দিলেও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কারখানা এখনও তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

‘স্টিচ’ নামক একটি আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথভাবে

পরিচালিত এ গবেষণা গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়জুড়ে পরিচালিত হয়। এতে ৩৮৫টি পোশাক কারখানা এবং ১,১১৩ জন শ্রমিকের ওপর জরিপ চালানো হয়। গবেষণায় দেখা যায়, ৩২ শতাংশ কারখানা এখনও সরকার নির্ধারিত নতুন মজুরি স্কেল কার্যকর করেনি। এসব কারখানার সবগুলোই দেশের রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড) এলাকার বাইরে অবস্থিত। অন্যদিকে, ইপিজেডভুক্ত সব কারখানায় নতুন মজুরি পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হয়েছে।

প্রসঙ্গত, নতুন মজুরি কাঠামো অনুযায়ী, ইপিজেড এলাকার বাইরের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১২,৫০০ টাকা, আর ইপিজেডে কর্মরতদের জন্য ১২,৮০০ টাকা।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বড় আকারের কারখানা, ট্রেড ইউনিয়ন বা পার্টিসিপেশন কমিটি-সমৃদ্ধ কারখানাগুলোর মধ্যে শতভাগ মজুরি বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া, যেসব কারখানা প্রধান শিল্প সংগঠনগুলোর সদস্য, তারা তুলনামূলক ভালোভাবে নির্দেশনা মেনে চলেছে।

তবে, শ্রমিকদের একটি অংশ এখনও প্রকৃত মজুরি পাচ্ছেন না বলে জানা গেছে। অনেকে তাদের পদবি বা গ্রেড সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় বিভ্রান্তিতে ভুগছেন। মজুরি কাঠামো সম্পর্কে যথাযথ তথ্যের অভাব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ঘাটতিও এর জন্য দায়ী।

গবেষণায় বলা হয়েছে, নতুন মজুরি কাঠামো বাস্তবায়নে কারখানাগুলোর ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। অথচ ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা মেলেনি। বড় ক্রেতার কিছুটা মূল্য সমন্বয় করলেও তা প্রায় অপরিাপ্ত, বিশেষ করে ছোট কারখানাগুলোর ক্ষেত্রে। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার কিছু ব্র্যান্ড তুলনামূলকভাবে ভালো সহায়তা করেছে, তবে সামগ্রিক চিত্র এখনও হতাশাজনক।

এছাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বাসভাড়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় বাড়ার কারণে শ্রমিকদের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। তার ওপর অধিকাংশ শ্রমিকই দীর্ঘ সময় কাজ

করতে বাধ্য হচ্ছেন।

প্রতিবেদনটি নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মজুরির বৈষম্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দেখা গেছে, নারীরা মূলত নিম্ন মজুরি ও পুনরাবৃত্তিমূলক কাজেই সীমাবদ্ধ থাকেন, আর পুরুষরা তুলনামূলক বেশি বেতনের কারিগরি বা সুপারভাইজারি পদের দখলে থাকে।

গবেষকরা বলছেন, সঠিক পরিকল্পনা, শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব এবং কারখানা-বায়ার সমন্বয় ছাড়া এই মজুরি বৃদ্ধির প্রকৃত সুফল শ্রমিকদের কাছে পৌঁছাবে না। জরুরি ভিত্তিতে কাঠামোগত সংস্কার ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ না করলে এই পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ ড. এবি মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, “দেশে শিক্ষার হার বাড়লেও মান বাড়ছে না। শিক্ষিত বেকার বাড়ছে। কর্মসংস্থান না বাড়ালে শ্রমিক শ্রেণি ভবিষ্যতে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।” তিনি আরও বলেন, জাতীয়ভাবে বিনিয়োগ ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের আয় বাড়ানোর পথ তৈরি করতে হবে।

২২ খাতের শ্রমিকদের মজুরি দারিদ্রসীমার নিচে

বাংলাদেশের ২২টি খাতের শ্রমিক এখনও আন্তর্জাতিক দারিদ্রসীমার নিচে মজুরি পাচ্ছেন। এর মধ্যে অন্তত ১৮টি খাতে ১৯৮৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত মজুরি পুনর্বিন্যাস হয়নি। এমন উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে শ্রম সংস্কার কমিশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে, যা গত ২১ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে জমা দেওয়া হয়।

কমিশনের প্রধান এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস)-এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ জানান, বিশ্বব্যাংকের নির্ধারণ করা আন্তর্জাতিক দারিদ্রসীমা অনুযায়ী, দৈনিক ২ দশমিক ১৫ ডলারের (প্রায় ৭৮৬৯ টাকা মাসিক) কম আয়ে

জীবনযাপন করলে কোনও ব্যক্তি দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছেন বলে বিবেচিত হয়। তিনি বলেন, ২০১৭ সালের ক্রয়ক্ষমতা সমতা (□□□) অনুযায়ী এই সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের বহু শ্রমিক এখনও এই আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার চেয়েও কম আয় করেন, যা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে চরম ব্যর্থতা ও সামাজিক বৈষম্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়ায়।

কমিশনের পর্যালোচনা অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৩৯টি খাতে ন্যূনতম মজুরি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে অর্ধেকের বেশি খাতে মজুরি এই দারিদ্র্যসীমার নিচে।

যেসব খাত এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে

প্রতিবেদন অনুসারে, টাইপ ফাউন্ড্রি (৫২১ টাকা), পেট্রোল পাম্প (৭৯২), বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (৩,০০০), হোটেল ও রেস্টোরাঁ (৩,৭১০), লৌহ ঢালাই ও ওয়ার্কশপ (৪,২৪০), আয়ুর্বেদিক (৪,৩৫০), ম্যাচ কারখানা (৪,৫৬০), পাট প্রেস (৪,৮৫০), দর্জি কারখানা (৪,৮৫০), তুলা টেক্সটাইল (৫,৭১০), এবং বেকারি ও বিস্কুট কারখানাসহ (৫,৯৪০) মোট ২২টি খাতের শ্রমিক এই সীমার নিচে মজুরি পান।

যেসব খাত তুলনামূলক ভালো মজুরি দিচ্ছে

আবার, যেসব খাতে মজুরি দারিদ্র্যসীমার ওপরে রয়েছে সেগুলো হলো—ওষুধ শিল্প (৮,০৫০), প্লাস্টিক ও বেসরকারি পাটকল (৮,০০০), ছাপাখানা (৮,১৫০), কাঁচ ও সিলিকেট (৮,৫০০), অ্যালুমিনিয়াম (৮,৭০০), নিরাপত্তা সেবা (৯,১৪০), মৎস্য (১০,৫২০), বেসরকারি সড়ক পরিবহন (১০,১০০), রি-রোলিং মিল (১০,৬৫০), হোমিওপ্যাথিক (১১,৫০০), পোশাক (১২,৫০০), ট্যানারি (১২,৮০০), এবং করাতকল (১৭,৯০০)।

চার দশকেও হয়নি মজুরি পরিবর্তন

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টাইপ ফাউন্ড্রির মজুরি সর্বশেষ নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৮৩ সালে,

পেট্রোল পাম্প ১৯৮৭ সালে, আয়ুর্বেদিক ২০০৯, লৌহ ঢালাই ২০১০, লবণ কারখানা ২০১১, ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রি ২০১৩, হোটেল-রেস্তোরাঁ ২০১৬ সালে। আইন অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছরে মজুরি পুনর্বিন্যাস বাধ্যতামূলক হলেও বাস্তবে তা হয়নি।

বাংলাদেশ হোটেল-রেস্তোরাঁ-মিষ্টান্ন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন বলেন, “আমরা দিনে ১২-১৩ ঘণ্টা কাজ করি, অথচ মাসে ৩-৪ হাজার টাকায় জীবন চলে না। সন্তানদের পড়াশোনা ও চিকিৎসা খরচ চালানো তো অসম্ভব।”

তিনি দাবি করেন, ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকার মধ্যে নির্ধারণ করতে হবে, নইলে শ্রমিকদের জীবনমান কখনোই উন্নত হবে না।

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি প্রস্তাব

শ্রম সংস্কার কমিশন প্রস্তাব করেছে, একটি জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে, যা সব খাত, সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি সংস্থা এবং স্বনিয়োজিতদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এছাড়া প্রস্তাব করা হয়েছে প্রতি তিন বছর অন্তর মজুরি পুনর্বিন্যাসের। একইসঙ্গে খাতভিত্তিক মজুরি কখনোই জাতীয় ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম না হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

শ্রমিকদের ৪ দফা দাবি

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের মতে, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে চারটি প্রধান দাবি রয়েছে—

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন।

ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ।

আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রম আইন সংস্কার।

সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থা চালু।

এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, “দারিদ্রসীমার নিচে মজুরি নির্ধারণ চরম অমানবিক। একটি পরিবার পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ আয় প্রয়োজন, সেটি হিসেব করে মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। অন্তত ২০ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি হওয়া উচিত।”

সস্তা শ্রম যে সব খাতে

দেশের অর্থনীতির প্রধান তিন চালিকাশক্তি—কৃষি, গার্মেন্টস এবং রেমিট্যান্স খাত। এই তিন খাতই দাঁড়িয়ে আছে সস্তা শ্রমের ওপর। কিন্তু যারা এই খাতগুলো চালিয়ে নিচ্ছেন, সেই শ্রমিকরাই আজ সবচেয়ে অবহেলিত। তাদের আয় দিন দিন বাস্তবতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পড়ছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন,

সস্তা শ্রমের ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতি দিয়ে শুধু প্রবৃদ্ধি টেকসই হয় না—এই প্রবৃদ্ধির সুফল যেন শ্রমিকরাও পান, তা নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রকে। বাজেটেই হতে হবে এর সূচনা। পরিসংখ্যান বলছে, ন্যূনতম মজুরি নেই ৮৪টি খাতে, যা মোট খাত-উপখাতের প্রায় ৬০ শতাংশ। অথচ পণ্যমূল্য বেড়েই চলেছে, জীবনযাপন ব্যয় সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে এইসব সস্তা শ্রমজীবী মানুষ।

কম মজুরি, অনিশ্চিত জীবন

বাংলাদেশে শ্রমিকদের গড় আয় দিয়ে একটি পরিবারের মাস চলা কঠিন। শ্রমিকদের অনেকেই বলছেন, “ভাত জুটলেও সবজি জোটে না, শিশুর জন্য দুধ কিনতে গেলে নিজের ওষুধ বাদ দিতে হয়।” ১৪২টি খাত-উপখাতের মধ্যে মাত্র ৫৮টিতে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো রয়েছে। বাকিগুলোর জন্য কোনও নীতিমালা বা সরকারি নির্দেশনা নেই। শুধু তাই নয়, নেই ন্যূনতম

মজুরির নিশ্চয়তা, নেই চিকিৎসা বা পেনশনের নিরাপত্তা। কাজের জায়গায়ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা দুর্বল।

ব্যয় বাড়ছে, আয় বাড়ছে না

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রায় অর্ধেক মানুষ শ্রমশক্তি হিসেবে গণ্য। প্রতিবছর নতুন করে ২২ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। কিন্তু যথাযথ কর্মসংস্থান নেই। একদিকে বেকারত্ব বাড়ছে, অন্যদিকে যাদের কাজ আছে, তাদের আয়ের দ্রুতগতি কমে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে বাংলাদেশে অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াতে পারে ১ কোটি ৫৮ লাখে। এর প্রধান কারণ— প্রকৃত আয় হ্রাস এবং দুর্বল শ্রমবাজার।

তেজগাঁওয়ের একটি প্রিন্টিং কারখানার শ্রমিক রুবিনা আক্তার বলেন, “১২ ঘণ্টা কাজ করি, তাও মাস শেষে ধার করতে হয়। ছেলেমেয়ের স্কুলের টাকা দিতে পারি না ঠিকমতো।”

মিরপুরে একটি গার্মেন্টসে কাজ করেন আবদুল করিম। তিনি বলেন, “ভাড়া, বাজার আর ওষুধের খরচ দিয়ে বাঁচাই মুশকিল। ওভারটাইম না করলে মাস চলেই না।

আজ ১ মে, মহান মে দিবস। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের গৌরবময় দিন এটি। দিনটি কেবল একটি বার্ষিক আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি শ্রমের মর্যাদা, অধিকার ও ন্যায্যতার ইতিহাসের অনন্য সাক্ষ্য। এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য: “শ্রমিক-মালিক এক হয়ে, গড়বো এ দেশ নতুন করে।”

সমাধানের পথ কী?

অর্থনীতিবিদ, শ্রমিক নেতা ও বাজেট বিশ্লেষকদের মতে—

প্রথমত, শ্রমিকবান্ধব বাজেটের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত আলাদা বরাদ্দ দরকার।

দ্বিতীয়ত, অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করা উচিত।

তৃতীয়ত, শ্রম আইনের প্রয়োগ, বিশেষত বেসরকারি খাতে, নিশ্চিত করতে কঠোর তদারকি ও মালিকপক্ষের জবাবদিহি বাড়াতে হবে।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের প্রতি চাপ তৈরি করতে হবে যেন তারা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করেন এবং সামাজিক মানদণ্ড মেনে চলেন।

অর্থনীতি পোশাক খাত

---

© 2025 TimesToday. All Rights Reserved.

Generated on 27 June, 2025 13:59

URL: <https://www.timestodaybd.com/public/economy/7758071700>